ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ ▶

এবোলা : আতঙ্ক সৃষ্টি করে স্বার্থ হাসিল কাম্য নয়

এবোলাসহ সব ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও প্রাকৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আফ্রিকার যেসব দেশে এই প্রাণঘাতী ভাইরাস অসংখ্য জীবন কেড়ে নিয়েছে, সেসব দেশের কোনো মানুষ অসুস্থ অবস্থায় ভ্রমণ করছে কি না তা কড়া নজরে রাখতে হবে। সেসব দেশে বাংলাদেশি নাগরিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের দায়িত্ব। এরই মধ্যে সরকার রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এবোলা ভাইরাস প্রতিরোধের ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ

এবোলা নিয়ে সারা বিশ্বে এখন এক অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. মার্গারেট চেন অতি সম্প্রতি আফ্রিকায় এবোলা ভাইরাস সংক্রমণের প্রাদুর্ভাবকে এক জরুরি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই ভাইরাস সংক্রমণ রোধে তিনি পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এবোলা ভাইরাসে সংক্রমণের শিকার সিয়েরা লিয়ন ও লাইবেরিয়ায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুটি দেশ ছাড়াও নাইজেরিয়া ও গিনিতে এবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে পোলিও এবং ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী সোয়াইন ফ্লুর প্রাদুর্ভাবের পর তৃতীয়বারের মতো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য নিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করল। ১৯৭০ সালে প্রথম এবোলা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর এবারকার সংক্রমণে সহস্রাধিক মানুষ এই দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুবরণ করেছে। ১৯৭৬ সালে কঙ্গোতে ৩১৮ জন আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ২৮০ জন মৃত্যুবরণ করে। ১৯৯৫ সালে কঙ্গোতেই আবার এবোলার প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ৩১৫ জন রোগীর মধ্যে ২৫৪ জন মারা যায়। ১৯৭৬ সালে সুদানে এবোলার কারণে ২৮৪ জন রোগীর মধ্যে ১৫১ জন মৃত্যুবরণ করে। ১৯৭০ সালের পর আফ্রিকার বহু দেশে দু-এক বছর পর পর এই রোগের আবির্ভাব ঘটেছে এবং আক্রান্ত রোগীর বেশির ভাগই মারা গেছে। ২০০১ সালে উগান্ডায় ৪২৫ জন এবোলা-আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ২২৪ জন মৃত্যুবরণ করে। ১৯৭০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার ১০টি দেশে ২৫ বার এবোলা সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং এতে তিন হাজার ৩৪৮ জন রোগীর মধ্যে দুই হাজার ৫৫১ জন মৃত্যুবরণ করেছে। মৃত্যুর হার গড়ে ৭৬ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান শুধু এটাই প্রমাণ করে, এবোলা সংক্রমণ ৪৫ বছর পরও অপ্রতিরোধ্য এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য এক মহাবিপর্যয় ও চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখাটিতে প্রদত্ত পরিসংখ্যান দেখে যে কারো মনে হতে পারে, এবোলা শুধু আফ্রিকায়ই সীমাবদ্ধ এবং আমাদের এই দুরারোগ্য রোগের জন্য আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কথাটি সত্য নয় এবং গ্রহণযোগ্যও নয়। সংক্রামক রোগের কারণে বিশ্বের কোনো দেশের, কোনো অঞ্চলের কোনো মানুষই শতভাগ নিরাপদ থাকতে পারে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, অন্যান্য জীবজন্তুর মতো সংক্রামক রোগের মুখ্য বাহক কিন্তু মানুষ। শুধু গত বছর প্রায় ২৫০ কোটি মানুষ বিমান ভ্রমণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করেছে। এ কারণে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ভয়ংকর সংক্রামক রোগ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এসব ভয়াবহ সংক্রামক রোগের কারণে পৃথিবীর ২৫ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ ১৭৫ কোটি মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। আগেই যেমন বলা হয়েছে, সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধ মানবসভ্যতা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য এক ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোগের বাহক হিসেবে মানুষের এই ভ্রমণের ফলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এইডস, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, সার্স ও এবোলার মতো সংক্রামক রোগ মোকাবিলার জন্য আমাদের হাতে কোনো কার্যকর ওষুধ বা ভ্যাকসিন নেই। আর এ কারণেই সংক্রামক রোগের সার্বিক ভয়াবহতার কথা বিবেচনা করে পৃথিবীর ধনী-দরিদ্র সদস্য দেশগুলোর মধ্যে এসব রোগের বিস্তার, প্রতিরোধ, প্রতিকার, চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদান স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ও উপযোগী উপায়গুলোর একটি হতে পারে।

কঙ্গোর একটি নদীর নাম এবোলা। এই নদীর নামেই নামকরণ করা হয়েছে ভাইরাসটির। এবোলা ভাইরাসঘটিত রোগ, যাকে আগে বলা হতো এবোলা হিমোরেজিক ফিভার বা এবোলা রক্তক্ষরণজনিত জ্বর। এবোলা মানুষের জন্য একটি ভয়ংকর প্রাণঘাতী রোগ। এই রোগে আক্রান্ত সর্বোচ্চ ৯০ শতাংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। রেইন ফরেস্ট বা বৃষ্টিপ্রধান ক্রান্তীয় অঞ্চলের জঙ্গলের নিকটবর্তী মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা গ্রামে এই রোগের উৎপত্তি। বন্য জীবজন্তুর মাধ্যমে এই রোগ প্রথমে মানুষকে সংক্রমিত করে এবং পরে মানুষ থেকে অন্য মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। টেরোপোডিডি (Pteropodidae) প্রজাতির এক ধরনের বাদুড়কে এবোলা ভাইরাসের প্রাকৃতিক বাহক হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতিতে পাঁচ ধরনের এবোলা ভাইরাস রয়েছে। এগুলো হলো যথাক্রমে বুন্ডিবিউগিও এবোলা ভাইরাস (Bundibugyo ebola virus), জায়ার এবোলা ভাইরাস (Zaire ebola virus), রেস্টন এবোলা ভাইরাস (Reston ebola virus), সুদান এবোলা ভাইরাস (Sudan ebola virus) এবং টাই ফরেস্ট এবোলা ভাইরাস (Tai forest ebola virus)। বুন্ডিবিউগিও, জায়ার ও সুদান এবোলা ভাইরাস আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এবোলা সংক্রমণের মূল কারণ। চীন ও ফিলিপাইনে রেস্টন এবোলা ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা হলেও এসব ভাইরাসের কারণে এ পর্যন্ত কোনো সংক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। সংক্রমিত জীবজন্তুর রক্ত, শরীর থেকে নিঃসৃত জলীয় পদার্থ, হাঁচি, কাশি, এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্পর্শের মাধ্যমে এবোলা ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে। আফ্রিকায় মানুষ কর্তৃক রেইন ফরেস্টে এবোলা আক্রান্ত শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ফলভুক বাদুড়, বানর, অ্যান্টিলোপ ও শজারুর মৃতদেহের সংস্পর্শে আসাকে এবোলা সংক্রমণের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আফ্রিকার বহু মানুষ এসব জীবজন্তু শিকার করে, স্বহস্তে কাটাছেঁড়া করে, রক্তপান করে এবং মাংস খায়। এতে সরাসরি সংস্পর্শে আসার কারণে পুরো সম্প্রদায়ের মধ্যে এবোলা ছড়িয়ে পড়ে। মরদেহ সৎকার করার সময় মানুষ মরদেহের সংস্পর্শে আসে বলে এই রোগের বিস্তার ঘটে। যৌন মিলনের কারণে এবোলা সংক্রমণ হতে পারে। এবোলা সংক্রমণ থেকে আরোগ্য লাভের সাত সপ্তাহ পরও বীর্যে এবোলা ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত রোগীর নিবিড় পরিচর্যা করার সময় যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ না করার কারণে প্রায়ই এবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এবোলা সংক্রমণের শিকার প্রত্যেক রোগীকে অনতিবিলম্বে সংক্রমণ রোধকল্পে নিরাপত্তামূলক এলাকায় (Quarantine) সরিয়ে নিতে হবে এবং আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত সেবা-শুশ্রূষা চালিয়ে যেতে হবে।

এবোলা ভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গগুলো বহুলাংশে বিভ্রান্তিকর। হঠাৎ করে জ্বর আসা, তীব্র দুর্বলতা অনুভূত হওয়া, পেশির তীব্র ব্যথা-বেদনা, মাথার যন্ত্রণা, গলা ব্যথা ও প্রদাহ, শরীরে দানা দানা গুটির উদ্ভব হলো এবোলা সংক্রমণের প্রধান প্রধান উপসর্গ। এর পরপরই দেখা দেয় বমি, ডায়রিয়া, র‍্যাশ, কিডনি ও লিভারের কার্যাবলি হ্রাস এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ রক্তক্ষরণ। এবোলায় আক্রান্ত রোগীর শ্বেত রক্তকণিকা ও প্লেটলেটের সংখ্যা হ্রাস এবং লিভার এনজাইমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মানুষের রক্ত ও শরীরের তরল পদার্থে যতক্ষণ ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে, ততক্ষণ একজন মানুষ এবোলায় আক্রান্ত বলে বিবেচিত হবে। এবোলায় আক্রান্ত হওয়ার ৬১ দিন পরও মানুষের বীর্যে ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা গেছে। ভাইরাস সংক্রমণ ও রোগের উপসর্গ দৃশ্যমান হওয়ার মধ্যে সময় লাগে ২ থেকে ২১ দিন।

এবোলা ভাইরাস রোগ নির্ণয় করার আগে যেসব সম্ভাব্য রোগের কথা সমান্তরালভাবে বিবেচনায় নিতে হয় তার মধ্যে রয়েছে—ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, শিগেলোসিস, কলেরা, লেপ্টোসিপরোসিস, প্লেগ, রিকেটসিওসিস, পুনরাক্রমণ জ্বর, মেনিনজাইটিস, হেপাটাইটিস এবং অন্যান্য রক্তক্ষরণজনিত জ্বর। তাই শুধু উপসর্গ দেখেই এবোলা সংক্রমণ নিশ্চিত করা যায় না, এর জন্য দরকার পরীক্ষাগারে ভাইরাস শনাক্তকরণ। পরীক্ষাগারে এবোলা ভাইরাস শনাক্ত করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিজেন শনাক্তকরণ পরীক্ষা, সিরাম নিষ্ক্রিয়করণ পরীক্ষা, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, সেল কালচারের মাধ্যমে ভাইরাস পৃথকীকরণ, এনজাইম লিঙ্কড ইমিওনোসরভেন্ট পরীক্ষা (ELISA) এবং রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন পরীক্ষা। আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ একটি ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া। তাই নমুনা সংগ্রহের আগে সংগ্রহকারীকে অত্যন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লাইবেরিয়ায় কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়নি এমন একটি ভ্যাকসিন 'জম্যাপ' দিয়ে এবোলার চিকিৎসা চলছে। ওষুধটি অপরীক্ষিত বলে যত ভয়। এবোলা রোগের চিকিৎসায় এখনো কোনো কার্যকর ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়নি। আক্রান্ত রোগীর একমাত্র চিকিৎসা বিশ্রাম, সেবা-শুশ্রূষা ও পানীয় পান। এবোলায় আক্রান্ত রোগীরা পানিশূন্যতায় ভোগে। তাই রোগীকে ঘন ঘন মুখে খাওয়ার স্যালাইন বা প্রয়োজনবোধে ইলেকট্রোলাইট (electrolyte) সমৃদ্ধ ইনজেকশন প্রদান করতে হয়। এবোলা ভাইরাস সংক্রমণ চিকিৎসায় এখনো কোনো কার্যকর ওষুধ বা ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত না হলেও এই প্রাণঘাতী রোগ প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণে আমাদের অবশ্যই কিছু করণীয় আছে। এবোলা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুহার এখনো হতাশাব্যঞ্জক হলেও তা কমিয়ে আনা কোনো দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। ব্যক্তিগত ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমরা যা করতে পারি তার মধ্যে রয়েছে—এক, ভয়ভীতি, শঙ্কা বা হতাশা নয়, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সুষম খাবার খাওয়া, ভিটামিন 'ডি' গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি, সাহস ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে এসব রোগ মোকাবিলা করতে হবে। দুই, অনেক রোগের ক্ষেত্রে ওষুধের চেয়ে সেবাযত্ন, ঘুম, পর্যাপ্ত পানি পান ও সুষম খাবার রোগীকে অতি দ্রুত আরোগ্যলাভে সাহায্য করে। তিন, আমাদের মনে রাখা দরকার, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু ও অন্যান্য ফ্লু নিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং বিশ্বব্যাপী অহেতুক আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল। এসব আতঙ্ক সৃষ্টির পেছনে ওষুধ কম্পানি, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও এক শ্রেণির চিকিৎসকের উসকানি থাকে। ১৯৭৬ সালেও বিশ্বব্যাপী সোয়াইন ফ্লু মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু মহামারি বাস্তবে রূপ নেয়নি। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, আক্রান্ত দেশগুলোতে জরুরি অবস্থা জারি করা হলেও অবস্থার তেমন অবনতি ঘটবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সাহায্য-সহযোগিতার আদান-প্রদান ইদানীং সহজলভ্য হয়ে ওঠার কারণে অনেক বিপর্যয় সময়মতো ঠেকানো গেছে। চার, এবোলা প্রাদুর্ভাবের সুযোগ নিয়ে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল, বিশেষ করে চিকিৎসক ও ওষুধ কম্পানিগুলো যাতে কোনো অকার্যকর বা ক্ষতিকর ওষুধ বা ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে লক্ষ-কোটি নিরীহ মানুষের ক্ষতিসাধন করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা ভুলে যাইনি, ১৯৭৬ সালে সোয়াইন ফ্লু মহামারির ভয় দেখিয়ে লাখ লাখ মানুষকে প্রতিষেধক প্রদান করা হয়েছিল, যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও মৃত্যুবরণ করেছিল। পাঁচ, ওষুধ দিয়ে ভাইরাস-সংক্রান্ত সংক্রমণ ঠেকানোর এখনো কোনো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। ওষুধ আরএনএ (RNA) ভাইরাসকে কার্যকরভাবে টার্গেট করতে পারে না। তাই এবোলাসহ সব ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও প্রাকৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ছয়, আফ্রিকার যেসব দেশে এই প্রাণঘাতী ভাইরাস অসংখ্য জীবন কেড়ে নিয়েছে, সেসব দেশের কোনো মানুষ অসুস্থ অবস্থায় ভ্রমণ করছে কি না তা কড়া নজরে রাখতে হবে। সেসব দেশে বাংলাদেশি নাগরিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের দায়িত্ব। এরই মধ্যে সরকার রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এবোলা ভাইরাস প্রতিরোধের ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ। সাত, সংক্রামক রোগসহ সব রোগের প্রতিরোধ, প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হবে এবং স্বাস্থ্য-সচেতনতা বাড়াতে হবে। আমাদের পড়াশোনা আর জানার আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। আর তাই অতি সাধারণ রোগের বেলায়ও আমরা কী করব তা বুঝে উঠতে পারি না। মনে রাখবেন, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য-সচেতনতার অভাবে আমরা প্রায়ই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদের সম্মুখীন হই।

পরিশেষে একটি প্রার্থনা, শুধু আক্রান্ত দেশের মানুষ নয়, আল্লাহ যেন বিশ্বের সব দেশের সব মানুষকে রোগমুক্ত জীবনযাপনের তৌফিক দান করেন।

লেখক : অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল ফার্মাসি ও ফার্মাকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
drmuniruddin@gmail.com